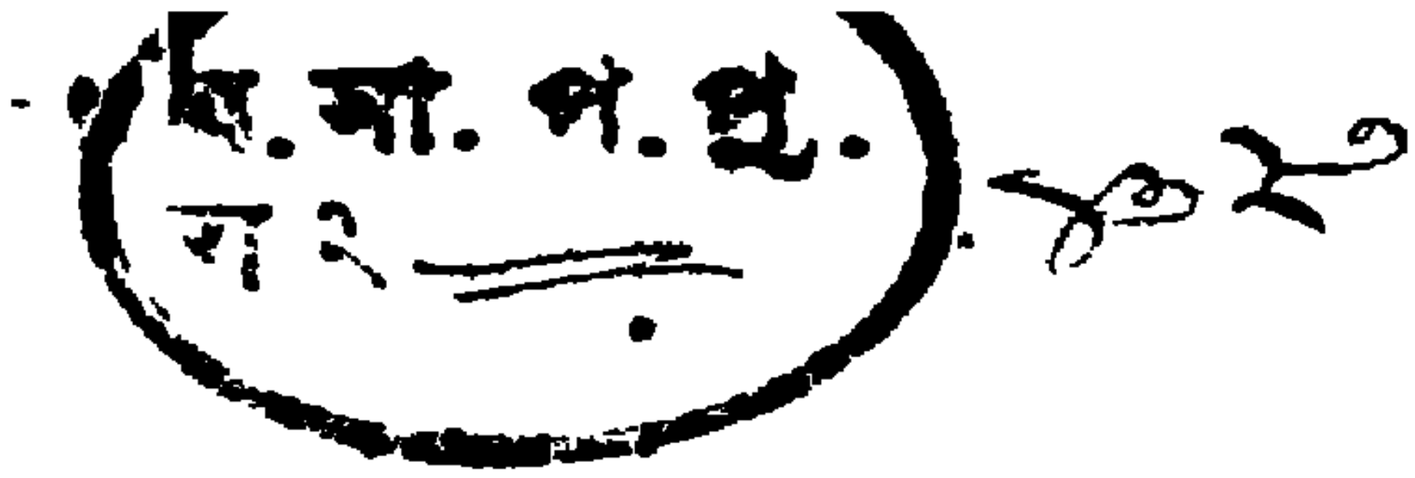

বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি।

বর্ত্তমান

বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি।

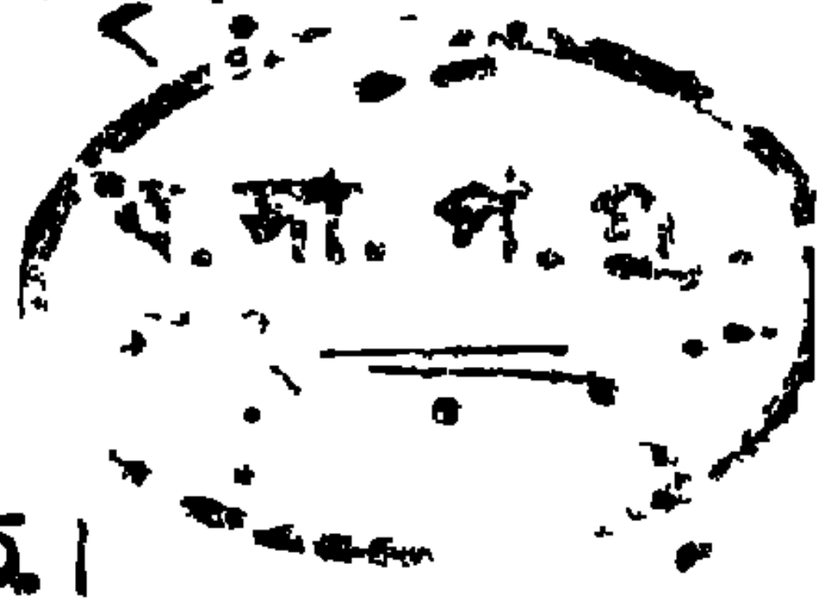

—o—

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু প্রণীত।

—•—

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

মেডিকেল লাইব্রেরী।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

কলিকাতা—হেয়ার প্রেসে

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্তের দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৬।

ব. সা. প. গ্র.
১৫৮৬৭

বর্ত্তমান

বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রকৃতি।

অগ্রে সাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক।

পৃথিবীতে যদি একটীমাত্র মনুষ্য থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় সে বাক্‌শক্তি হীন হইত। বাক্‌শক্তি থাকিলেও, বোধ হয় তাহাকে তাহা ব্যবহার করিতে হইত না। মনুষ্যের সংখ্যা একাধিক বলিয়াই তাহাদিগকে কথা কহিতে হয়। অন্যকে আপন আপন অভিপ্রায়াদি জ্ঞাপন করিবার জন্যই লোকে কথা কয়। লোকে লেখেও সাধারণতঃ সেই জন্য।

যাহার অন্যকে কিছুই বলিবার ইচ্ছা বা অভিপ্রায় নাই সে লিখিবে কেন? সে মনের কথা মনেই রাখিয়া দিবে। মনের কথা বিস্মৃত হইবার ভয়ে যদিও লেখে, তাহা হইলে যাহা লিখিবে তাহা আপনার কাছেই রাখিয়া দিবে, অন্যকে পড়িতে দিবে না। সে যদি পুস্তকাদি লিখিয়া বিক্রয় বা বিতরণ করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহার অভিপ্রায়, অন্যে তাহার পুস্তকাদি পাঠ করে। দার্শনিক বল, কবি বল, ইতিহাসবেত্তা বল, বৈজ্ঞানিক বল, সকলেরই সম্বন্ধে এই কথা বলিতে পারা যায়। কিন্তু অপরে যাহা পড়িবে, তাহাতে এমন কিছুই থাকা উচিত নহে, যদ্দ্বারা অপরের অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে। ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ অপরের অনিষ্ট করিবার অধিকার কাহারই নাই—দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, কবি, নাটককার, উপন্যাসকার, কাহারই নাই। অপরকে যদি কিছু পড়িতে দিতে হয়, তবে তাহা এরূপ প্রকৃতির হওয়া উচিত ও আবশ্যক যে, তাহা পড়িয়া অপরের অপকার না হইয়া উপকারই হয়। অতএব অপরে যাহা পড়িবে, অপরের হিতাহিতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহা লেখা

কর্ত্তব্য। কেবল আপন মনের আবেগের বশবর্ত্তী হইয়া অথবা আপন তৃপ্তি সাধনের জন্য লেখা অন্যায় ও অবিধেয়। স্বভাব চরিত্রের বিভিন্নতা বশতঃ মনের আবেগ ভালও হইতে পারে, মন্দও হইতে পারে, তৃপ্তিসাধন, ভাল কথা লিখিয়াও হইতে পারে, মন্দ কথা লিখিয়াও হইতে পারে। সুতরাং লোকের কেবল মনের আবেগে লিখিবার বা আপন তৃপ্তি সাধনের জন্য লিখিবার অধিকার আছে, ইহা স্বীকার করিলে, অতি জঘন্য এবং সমাজের বিষম অনিষ্টকর লেখা সম্বন্ধেও কোন আপত্তি করিতে পারা যায় না। কিন্তু আপত্তি যে হইতে পারে বা হওয়া কর্ত্তব্য, রাজবিধানে অশ্লীল লেখার দণ্ডের ব্যবস্থাতেই তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। যে সাহিত্যে বা সাহিত্যের যে সকল অংশে সমাজের অনিষ্ট সাধিত হয়, অথবা লোক মধ্যে কুরুচি, কু-প্রবৃত্তি, কুৎসাপ্রিয়তা, ঈর্ষা, অসারতা, আড়ম্বর প্রিয়তা, কপটতা প্রভৃতি অসদ্‌গুণের সৃষ্টি বা বৃদ্ধি সাধন করে, তাহা সাহিত্য নামের অযোগ্য, সাহিত্য নামে তাহা অভিহিতই হইতে পারে না। আবার যদ্দ্বারা লোকের উপকার সাধন করিতে

হয় তদ্দ্বারা যত অধিক পরিমাণে এবং যত অধিক লোকের উপকার সাধিত হয় ততই ভাল, তাহার সার্থকতা ততই বেশী হয়। সাহিত্য হইতে উপকারের পরিমাণ যত বেশী হয় এবং যত অধিক লোকের উপকার হয়, উহার সার্থকতারও তত বৃদ্ধি হয়, উহা সাহিত্য নামেরও তত যোগ্য হয়। লোক মধ্যে সাহিত্য যত সুশিক্ষা প্রচার করিবে এবং সদিচ্ছা, সৎপ্রবৃত্তি ও সদ্‌ভাবের উদ্রেক করিবে, উহার উদ্দেশ্য তত সিদ্ধ হইবে, উহার প্রকৃতি তত উন্নত হইবে। সুশিক্ষিত, সুনীতিপরায়ণ, সচ্চরিত্র, সদাশয, উদারহৃদয সেবক পাইলেই সাহিত্যের এই-রূপ সিদ্ধি ও উন্নতি হয়। আর সাহিত্যের দ্বারা অধিক লোকের অর্থাৎ সমাজের উচ্চ নীচ শ্রেণী নির্ব্বিশেষে লোকসাধারণের উপকার সাধন করিতে হইলে, সাহিত্যসেবীদিগকে এমন করিয়া সাহিত্য রচনা করিতে হয, সাহিত্যে এমন ভাষার ব্যবহার করিতে হয যে, উহা লোক সাধারণের যতদূর সম্ভব বোধ-গম্য ও আয়ত্ত হয। যাহা সকলের পাঠ্য হইবার উপযুক্ত, সকলে বুঝিতে পারে এরূপ সরল, সহজ, স্থানীয-বিশেষত্ব বর্জ্জিত ভাষায় তাহা লিখিত হওয়া

কর্ত্তব্য। তাহলে তদ্দ্বারা অধিক লোকের উপকার সাধিত হয় না। দর্শন বা বিজ্ঞানের উচ্চতম অংশ বা তদ্রূপ বিষয় সকল লোক সাধারণের পাঠ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না বটে এবং সেই জন্য সচরাচর এমন কঠিন ভাষায় ও দুরূহ প্রণালীতে লিখিত হয় যে, ঐ সকলের অধ্যয়ন প্রায়ই এক এক ক্ষুদ্র শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু চেষ্টা করিলে ঐ সকল বিষয়ও এমন ভাষায় লিখিতে পারা যায় যে এখনকার অপেক্ষা অধিক লোকে উহাদের অধ্যয়ন ও আলোচনায় নিযুক্ত হইতে পারে। দর্শন বিজ্ঞানাদি বিষয়ক ইংরাজী গ্রন্থাদির ভাষা এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে সাধারণের উপযোগী ও বোধগম্য করা হইতেছে। অবশ্য পরিভাষার কথা স্বতন্ত্র।

কোন জাতির মধ্যে সাহিত্য লোকসাধারণের যত উপযোগী হয় উহা ততই জাতীয় ভাবাক্রান্ত হইতে থাকে এবং যাহাদিগকে লইয়া সেই জাতি তাঁহাদেরও মনে এক জাতীয়তার ভাব তত উদ্রিক্ত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। সমগ্র জাতির মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সাহিত্য রচনা করিলে সাহিত্যের

সাহায্যে বড় বৃহৎ, বড় মহৎ, বড় সুন্দব, বড় পবিত্র কার্য্য করিতে পাবা যায়। সাহিত্য বড় সামান্য সামগ্রী নহে, বড় সহজ সামগ্রীও নহে। সুপ্রণালীতে বচিত হইলে, উহা জাতি গড়িবাব কার্য্যে যেমন সহাযতা কবে, কুপ্রণালীতে বচিত হইলে, জাতি ভাঙ্গিবার পক্ষে তেমনই কার্য্যকব হয, জাতি গঠনেব তেমনই প্রতিবন্ধকতা ক'বে। গঠনের গুণে সাহিত্য যেমন সুন্দব, যেমন অমৃতময ফল প্রসব কবে, গঠনেব দোষে তেমনই কদর্য্য, তেমনই বিষময় ফল প্রদান কবে। যে সাহিত্যের ফল কদর্য্য ও বিষময, যে সাহিত্য জাতি ভাঙ্গে বা জাতি গড়িতে দেয না, তাহা জাতীয সাহিত্যও নহে, প্রকৃত সাহিত্যও নহে। এইবাব বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যেব প্রবৃত্তিব কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

যখন ৺ গৌবমোহন আঢ্য মহাশযেব স্কুলের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শেণীতে পড়িতাম, তখন বিদ্যাসাগর মহাশযের বেতাল পঞ্চবিংশতি আমাদের পাঠ্য ছিল। তখন বিদ্যাসাগব মহাশযের বাঙ্গালা লেখাব বড়ই প্রশংসা শুনিতাম। এখনও যে না শুনি তাহা

নহে। কিন্তু এখন তিনি যেন একটু চাপা পড়িয়াছেন, তাঁহার লেখা কিছু পুরাতন প্রণালীর বলিয়া এখন বিবেচিত হয, বোধ হয আব বড় পঠিতও হয না। তিনি লিখিতে আবম্ভ কবিবাব কিছু দিন পবে তাঁহা হইতে এক ভিন্ন শ্রেণীর লেখক বাঙ্গালা লিখিতে থাকেন। তাঁহাদের প্রায সকলেই ইংবাজীওযালা, সংস্কৃতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ অথবা অল্পই অভিজ্ঞ। তাঁহাদেব লেখা পড়িযা অনেকে তখন বলিতেন যে 'বাঙ্গালা ভাষাটা বেওযাবিস্ ভাষা'। বোধ হয কথা-টাব অর্থ এই যে, কোন সম্পত্তিব ওযাবিস্ বা উত্তবা-ধিকাবী না থাকিলে, লোকে যেমন আপন আপন ইচ্ছামত উহাব বে-আইনী ভোগ দখল কবিযা থাকে, নব্য লেখকেবা তেমনই ব্যাকবণজ্ঞানেব অভাবে ব্যাকিবণদুষ্ট লেখা লিখিযা থাকেন। প্রধানতঃ ব্যাক-রণদোষেব প্রতি লক্ষ্য কবিযাই যে লোকে ঐ কথা বলিতেন, তখনকার প্রধান প্রধান নব্যলেখকদিগের গ্রন্থেব সমালোচনা পড়িলে তাহাই প্রতীতি হয। সে সকল সমালোচনায অন্য দোষ অপেক্ষা ব্যাকরণ দোষেবই বেশী আলোচনা থাকিত এবং ঐরূপ দোষ লইযাই বেশী ঠাট্টা বিদ্রূপ গালাগালি কবা হইত।

যে শ্রেণীর লোকে নব্য লেখকদিগকে ব্যাকরণে মূর্খ বলিয়া গালি দিতেন এবং বাঙ্গালা ভাষাকে বেঙ্গেযাবিস্ ভাষা বলিতেন, সে শ্রেণীর লোক এখনও আছেন—তাঁহাদের প্রায় সকলেই প্রাচীন পণ্ডিত শ্রেণীর লোক। এক সময়ে মনে হইয়াছিল তাঁহারাই নূতন বাঙ্গালা ভাষা গঠিত করিবেন এবং নূতন বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহাদের আধিপত্য স্থাপিত হইবে। তারাশঙ্কর, মদনমোহন, , দ্বারকানাথ, ঈশ্বরচন্দ্র, চন্দ্রকান্ত প্রভৃতিকে দেখিয়া এইরূপ ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের আধিপত্য হইয়াও হয় নাই। তাঁহারা জীবিত থাকিতে থাকিতেই নব্য লেখকেরা সাহিত্য সেবায় প্রবৃত্ত হন। প্রাচীনেরা তাঁহাদিগকে ব্যাকরণে মূর্খ বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন। দুই চারি জন অনধিকারী, শুদ্ধ অসূয়া পরবশ হইয়া, সে ঘোষণারও ঘোষণা করিল। লোকে কিন্তু সে ঘোষণাও শুনিল না, সে ঘোষণার ঘোষণাও শুনিল না। নব্য লেখকেরা সংখ্যায় প্রবল হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের পাঠকের সংখ্যাও প্রবল হইতে লাগিল। এখন নব্য লেখকদিগেরই বাঙ্গালা সাহিত্যে এক

প্রকাব একাধিপত্য। প্রাচীন শ্রেণীব লেখক যে একেবাবে নাই তাহা নহে। কিন্তু তাঁহাবা যেন এক পার্শ্বে গিযা দাঁড়াইযাছেন এবং অনেক স্থলে নব্যদিগের সহিত মিত্রতা করিয়া নব্যদিগেরি অনেক বিধিব্যবস্থা গ্রহণ কবা শ্রেযঃ জ্ঞান করিতেছেন। 'বাঙ্গালা ভাষাটা বেওযারিস্ ভাষা'—এই কাবণে এই কথাটা এখন আব বড শুনা যায না। শুনা যায না বটে; কিন্তু বাঙ্গালা লেখা সম্বন্ধে এ কথাটা তখনকার অপেক্ষা এখনই বেশী খাটে। কাবণ এখনকাব বাঙ্গালায তখনকাব ন্যায ব্যাকবণ দোষ ত আছেই; তদ্ব্যতীত অন্য বকমেব এমন অনেক দোষ দৃষ্ট হয, যাহা তখনকাব লেখায দৃষ্ট হইত না অথবা অল্পই দৃষ্ট হইত। এই সমস্ত দোষেব মূল মানসিক অসাবত্ত্ব এবং চবিত্রেব দুর্ব্বলতা। তখনও আমাদেব মানসিক অসাবতা ও চবিত্রেব দুর্ব্বলতা ছিল, সুতবাং তখনকাব লেখাতেও এই সকল দোষ থাকিত। কিন্তু এখন বোধ হয় আমাদের মানসিক অসারতা ও চরিত্রেব দুর্ব্বলতা বাডিযাছে, নহিলে এখনকাব লেখায ঐ সকল দোষ তখনকার অপেক্ষা এত অধিক দৃষ্ট হয় কেন? স্বদেশানুবাগ, স্বজন-

প্রিয়তা, প্রীতি, ভক্তি, দযা, পবোপকারপ্রিযতা প্রভৃতি মানবহৃদয়ের উৎকৃষ্ট ভাব সকল আমাদের নাই। কিন্তু আমাদের লেখা পড়িলে অপরে মনে করিতে পারে যে, আমাদেব ন্যায স্বদেশানুবাগী, প্রীতিভক্তিপবাযণ, দযালু, পবোপকারপ্রিয জাতি পৃথিবীতে আব কোথাও হয় নাই এবং হইবে না। যখন স্কুলে পড়িতাম তখনও কাহাকে ভাবতমাতাব জন্য কাঁদিতে শুনি নাই, ভাবতমাতাব পূর্ব্ব গৌববেব আস্ফালনে আকাশপাতাল বিকম্পিত প্রতিধ্বনিত কবিতে দেখি নাই। কিছুদিন পরে দেখিলাম এক ব্যক্তি একটী কবিতা লিখিলেন এবং আব এক ব্যক্তি একটা মেলা বসাইলেন, আর অমনি ভারতমাতার জন্য কান্নাব বোল উঠিল এবং তাঁহাব উদ্ধাবের উদ্দেশে বীরত্বেব বিকট চীৎকার শুনা যাইতে লাগিল। স্বদেশানুবাগেব ঐ যে একটা ভাণ আরম্ভ হইল, উহা দেখিযা ভক্তি, প্রীতি প্রভৃতি হৃদয়ের অন্যান্য শ্রেষ্ঠতম ভাবগুলিবও ক্রমে ক্রমে ঐরূপ ভাণ কবা হইতে লাগিল। আমবা পিতা মাতাকে ভক্তি করি না। কিন্তু বক্তৃতায, পুস্তকে, প্রবন্ধে, সংবাদপত্রে পৃথিবীব পবলোকগত মহাপুরুষ-

দিগের কথা এমনই গদ্গদভাবে কহিয়া থাকি এবং তাঁহাদের পূজা করা না হইলে এতই তীব্র তিরস্কার লোকের কর্ণগোচর করাই যে, আমাদিগকে যাহারা জানে না তাহারা বোধ হয় মনে করে যে, ভক্তি জিনিসটা ভূমণ্ডলে আমাদের মধ্যে প্রথম দেখা দিয়াছে। আমাদের সহোদরে সহোদরে মিল হয় না। আমরাই কিন্তু বড় বড় প্রেমতত্ত্ব লিখি, বিশ্বপ্রেমের কথায় পুস্তক, প্রবন্ধ, পত্র, পত্রিকা পূর্ণ করিয়া ফেলি। এইরূপ অনেক বিষয়েই দেখিতে পাই, আমাদের অন্তরে কিছুই নাই, কিন্তু মুখে ও লেখনীতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বহিয়াছে। রাগ জিনিসটা খুব ভাল না হইলেও, স্থল বিশেষে উহারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমাদের রাগও নাই। পাহারা-ওয়ালায় কোথাও কাহাকে পাঁচ আইনের নাম করিয়া ধরিলে যাহারা এইরূপ লেখে—পথিক পথের ধারে বসে নাই, বসিবার উপক্রম করিতেছে মাত্র, এমন সময় দুই দিক হইতে দুই জন কনষ্টেবল যমদূতের ন্যায় আসিয়া তাহাকে ধরিল। ইহা দেখিয়া কে না বলিবে যে দেশ অত্যাচারের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, ঘোর অরাজকতা হইয়া উঠিয়াছে,

দেশে ইংরাজ রাজ্য আর নাই, দেশটা মগের মুলুক হইয়াছে ?—সত্য সত্যই তাহাদের রাগ নাই। তাহারা স্বদেশানুরাগ, ভক্তি, প্রীতি প্রভৃতির যেমন ভাণ করে, রাগেরও তেমনই ভাণ করে। সুতরাং তাহাদের রাগের ভাষাও যে প্রকৃতির, ভক্তি, প্রীতি প্রভৃতির ভাষাও সেই প্রকৃতির। প্রীতি, ভক্তির ন্যায় আমাদের চিন্তাশীলতারও বড় অভাব। কিন্তু সে জন্য আমাদের কিছুই আসিয়া যায় না। আমরা প্রীতি ভক্তি প্রভৃতির ন্যায় যেমন ভাণ করি, চিন্তাশীলতারও তেমনই ভাণ করি। আমরা গভীর কথা কহিতে পারি না, কিন্তু গভীর লেখক বলিয়া প্রশংসিত হইবার জন্য লালায়িত। সুতরাং বিপরীত বাগ্‌জাল বিস্তার করা ভিন্ন আমাদের আর উপায় নাই। সহজ কথায় বক্তব্য বলিলে লোকে চিন্তাশীল বলিবে না, এই মনে করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া উহা বিষম বাঁকা করিয়া বলি। পরিষ্কার করিয়া কথা কহিলে সকলেই বলিবে, সামান্য কথা, না কহিলেই হইত; এই জন্য প্রাণান্তকর প্রয়াসে হেঁয়ালীর ছন্দে কথা কহি, যেন কথার ভিতর কতই গূঢ় তত্ত্ব লুকাইয়া

রাখিযাছি, বুদ্ধি থাকেত বুঝিযা লও। এই সকল কাবণে এখনকার বাঙ্গালা লেখায নানা দোষ বিস্তর গুরুতব দোস জন্মিতেছে। বাহুল্য দোষ বিষম প্রবল। যাহা তিন ছত্রে লেখা যায, তাহা টানিযা ত্রিশ ছত্র কবা হয ; যাহা ত্রিশ পৃষ্ঠায শেষ কবা উচিত, তাহা ফাঁপাইযা ফুলাইযা তিন শত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত কবাও কঠিন হয। তিলে খাজাব গুড়ও বোধ হয এত টানা হয না ; পাউরুটিব ময়দাও বোধ হয এত ফাঁপান হয না ; কুমড়া বড়িব দালও বোধ হয এত ফেনান হয না। সবলতাবও বড় অভাব। কেহ খাঁটি মনেব কথা খাঁটি কথায কহিতেছে, অনেক স্থলে এরূপ বুঝিতে পাবা যায না। পবনিন্দায যেন প্রাণ পড়িযা আছে, কুৎসাব তুল্য জিনিস যেন আর নাই। গাম্ভীর্য্য ও প্রশান্ততাব পবিবর্ত্তে অনেক স্থলে চপলতা, আস্ফালন, উগ্রতা এবং ঔদ্ধত্যের বিষম প্রাদুর্ভাব দেখা যায। লিখিবাব বিষযেব লঘুত্ব গুরুত্বের পবিমাণ কবিতে না পাবিযা অনেকে সকল বিষযেই সমান বাচালতা প্রদর্শন করেন, সমান আড়ম্বব আস্ফালন করেন। রাগ ত কথায় কথায ; তেজেব সীমা নাই, যেন সকলেই

এক একটা দুর্ব্বাসা। সপ্তমে ভিন্ন অনেকে সুর ধরিতে পারেন না—গীত গোষ্পদেরই হউক, হিমালয় হিন্দুকুশেরই হউক। আমাদের সাহিত্যের এক একটা প্রদেশে বাস করিতে পারা যায় না, প্রবেশ করিতেও ভয় হয়। সেখানে ঝড় ভিন্ন আর কথা নাই, বাতাস উঠিল কি অমনই ঝড়—অষ্ট-প্রহর ঝড়। কলিকাতার একটী ক্ষুদ্র পল্লীর একটী অতি ক্ষুদ্র পুস্তকালয়ের প্রথম বৎসরটী অতিবাহিত হইবামাত্র একটা মহোৎসব হইল। অমনি ঝড় উঠিল—

যে সর্ব্বশক্তিমান পরম পুরুষের অনন্ত কৌশলে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত কাল অনন্ত পথে পরি-চালিত হইতেছে তাঁহার অসীম কৃপায় আমাদের এই পুস্তকালয় আজ দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল।

যে ঝড়ে ধূলা বালি উড়াইয়া লোককে কেবল জ্বালাতন করে, সে ঝড় মরুভূমে যত বহিয়া থাকে অন্য কোন স্থানে তত বহে না। আমাদের মনগুলা মরুভূমি হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গালা লেখার যে সকল দোষের অতি অল্পমাত্র উল্লেখ করিলাম, সে সকল দোষ পণ্ডিত শ্রেণীর

লিখিত বাঙ্গালা সাহিত্যে ছিল না। সুতরাং বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহার দোষ সংখ্যায়ও যেমন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, প্রকৃতিতেও তেমনই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। এই সকল দোষের সম্পূর্ণ সংস্কার না হইলে বাঙ্গালা সাহিত্য সাহিত্য নামের যোগ্য হইবে না, সাহিত্য সমাজের যে মঙ্গল সাধন করিয়া থাকে সে মঙ্গল সাধন করিতে ত পারিবেই না, অধিকন্তু বিষম অনিষ্ট সাধন করিবে। এখনকার বাঙ্গালা সাহিত্য বাঙ্গালীর উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশী করিতেছে। কিন্তু এ সকল দোষের সংস্কার সহজে হইবে বলিয়া বোধ হয় না। এ সকল দোষের উৎপত্তি আমাদের মনে। আমাদের মনের সংস্কার না হইলে, মনের সারবত্তা না জন্মিলে, এ সকল দোষের ও সংস্কার হইবে না, বাঙ্গালা সাহিত্যের ও সারবত্তা বাড়িবে না। মনের সংস্কার বড়ই কঠিন, মনের অসারতা ঘুচিয়া সারবত্তা হওয়া, সামান্য শিক্ষার ও স্বল্প সাধনার কাজ নয়। সুতরাং এখনকার বাঙ্গালা সাহিত্যের এই শ্রেণীর দোষ যে শীঘ্র তিরোহিত হইবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে না। তবে লেখকেরা

ইচ্ছা করিলে যে এইরূপ কোন কোন দোষের কিঞ্চিন্মাত্র প্রতিকার করিতে পারেন না, ইহাও মনে করিতে পারি না। যাহা ৭।৮ ছত্রে লিখিতে পারা যায়, প্রতিজ্ঞা করিলে তাহা ছড়াইয়া এক শত ছত্র না করিয়া অন্ততঃ পঞ্চাশ ছত্রেও শেষ করা যাইতে পারে। কিন্তু দুর্ব্বল মনে প্রতিজ্ঞা সহজে আসে না, আসিলেও অধিকক্ষণ থাকে না, ইহাও সংস্কার পক্ষে একটা অন্তরায় বটে। অতএব বাঙ্গালা সাহিত্যের এ দিকটা ছাড়িয়া এখন আর এক দিকে যাইব। সে দিকে যে দোষ আছে তাহা গুরুতর হইলেও, এত গুরুতর নহে, তাহার প্রতিকারও এত কঠিন হইবে না।

কয়েক বৎসর দেখিতেছি, গ্রাম্যতা ও অপভ্রংশ পূর্ণ ভাষা পুস্তক প্রবন্ধাদিতে ব্যবহৃত হইতেছে।

উদাহরণ :—

(১) তাঁর সেই কোমল স্নেহের স্বরে আমি অনেক তৃপ্তি অনুভব করলুম, বললুম।

(২) আমি আজ বিশ্রাম কচ্ছি।

(৩) দুপুরের সময় একাই বেড়াতে বেরলুম।

(৪) বদরিকাশ্রম ত্যাগের প্রস্তাব কল্লুম।

(৫) আমার সঙ্কল্প আমি ছাড়চিনে।

(৬) লাঙ্গল খানা ধড়াস করিয়া ফেলিয়া।

(৭) এক খাবল তৈল লইয়া।

(৮) কেহ তোমার কাছে ঘেড়োবে না।

(৯) তাঁহার ভোগ বিলাস নাই, তিনি আহার করেন অনাথ অনাথিনীরা যা তাই, তাহার চেয়ে খারাপ ত ভাল নয়।

(১০) সারস পক্ষী অপরাজিত অধ্যবসায়ের সহিত টপাটপ্ বাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

(১১) বিষয় স্পৃহা তাহার মনের চৌকাট্ ডিঙাইতে পারে না।

(১২) নগরকে নগর কাটিয়া ওয়ার করিয়া দেয়।

(১৩) পথশ্রান্তি নিবন্ধন যে যেখানে পাইল সে সেইখানেই তাম্বু গাড়িতে আরম্ভ করিল।

পুস্তকাদিতে এরূপ ভাষা ব্যবহৃত হইবার অযোগ্য। এরূপ ভাষায় সাহিত্যের মর্য্যাদার হানি হয়। আপনা আপনির মধ্যে কথা কহিতে হইলে,

কথার শ্লীলতা, সৌষ্ঠব, সৌন্দর্য্যের দিকে কেহই অধিক দৃষ্টি রাখে না। কথা ভাঙ্গিয়া হউক, মুচড়াইয়া হউক; যেমন করিয়া হউক, শীঘ্র ও সংক্ষেপে কহিতে পারাই সকলে আবশ্যক মনে করে। কিন্তু পুস্তকাদি লিখিয়া বাহিরের লোকের সহিত,সমাজের সহিত কথা কহিতে হইলে, লোকে ভিন্ন প্রণালীতে কথা কহে, শব্দের সৌষ্ঠব, সৌন্দর্য্য, শ্লীলতা, সম্পূর্ণতার দিকে দৃষ্টি রাখে। অনেক বিষয়ে মানুষের আচার, ঘরে এক প্রকার, বাহিরে ভিন্ন প্রকার। মানুষের পরিচ্ছদ, ঘরে আপনার লোকের কাছে এক প্রকার, বাহিরে অপর লোকের কাছে অর্থাৎ সমাজে ভিন্ন প্রকার।' গৃহে আমরা ক্ষুদ্র হউক, মলিন হউক, এক খানা বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকি, গৃহের বাহিরে যাইতে হইলে, এক খানি ভাল বস্ত্র পরিধান করি, গায়ে একটী জামা দিই, এক খানি উড়ানী বা চাদরও গ্রহণ করি। পরিচ্ছদের সহিত ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের পরিচয় বড়ই অল্প, অপরিচয়টাই কিছু বেশী। কিন্তু গৃহের বাহির হইতে হইলে, তাঁহারাও একখানা উত্তরীয় স্কন্ধে ফেলিয়া থাকেন। মলিন বা ক্ষুদ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া অপরের নিকট গমন করিলে, অপরের অম-

র্য্যাদা করা হয়, সকল দেশের লোকেরই এইরূপ সংস্কার। ঘর হইতে বাহির হইতে হইলেই, পরিবার ছাড়িয়া সমাজে প্রবেশ করিতে হইলেই, মানুষ একটু সাজসজ্জা করিয়া থাকে—পরিচ্ছদেও করিয়া থাকে, ভাষাতেও করিয়া থাকে—নহিলে সমাজের অমর্য্যাদা হয়। অনেকে বলেন, পরিচ্ছদাদি সম্বন্ধে ঘরে বাহিরে প্রভেদ করা অন্যায়, অযৌক্তিক। কিন্তু অন্যায়ই হউক আর অযৌক্তিকই হউক, প্রভেদটা এত প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং এত সর্ব্ববাদিসম্মত যে, উহা উঠাইয়া দিতে বলা যেমন বাতুলতা, অমান্য করা তেমনই ধৃষ্টতা এবং অশিষ্টতা। সাহিত্যে এরূপ ভাষা ব্যবহার করিলে সমাজের অবমাননা করা হয়।

সাহিত্যে এরূপ ভাষা পরিহার করিবার অন্য হেতুও আছে। একই শব্দ লোকে নানা স্থানে নানা প্রকারে ভাঙ্গে। 'খাইলাম' এই শব্দের একাধিক অপভ্রংশ আছে :—

১ খেলাম ; ২ খালাম , ৩ খেলুম , ৪ খেনু।

'গমন করিলাম', ইহারও একাধিক অপভ্রংশ প্রচলিত দেখা যায়

১ গেলাম ; ২ গেলুম ; ৩ গেনু।

'করিলাম', ইহার ও ঐরূপ :—

১ কর্‌লাগ ; ২ কল্লাম, ৩ কবলুম ; ৪ কল্লুম ; ৫ কন্নু।

অধিক উদাহবণ অনাবশ্যক। সকলে এক প্রকারে ভাঙ্গে না। সেই জন্য অপভ্রংশ নানা আকার ধারণ কবিযা থাকে। সে সকল আকারে এত প্রভেদ যে, এক জেলাব লোক অনেক স্থলে অন্য জেলার অপভ্রংশ বুঝিতে পারে না। বুঝিতে না পাবিবারই কথা। যাহাবা 'কবিলাম' ভাঙ্গিযা 'কল্লুম' কবে এবং যাহাবা করিলাম ভাঙ্গিযা 'কন্নু' কবে, তাহাদেব পরস্পবকে বুঝিতে না পারাই সম্ভব। শ্রীহট্টেব অনেক লোকে 'কবিলাম' শব্দ ভাঙ্গিযা 'কল্লাম' শব্দেব ব্যবহাব কবে, কিন্তু আমাদের ন্যায 'কন্নু' শব্দেব ব্যবহাব কবে না। সুতবাং আমাদেব লিখিত কোন পুস্তকে 'আমি ঐ কার্য্যটী কন্নু', যদি এই বাক্যটী থাকে, তাহা হইলে অনেক শ্রীহট্টবাসী উহাব অর্থ বুঝিতে পাবিবে না। অপর পক্ষে কোন শ্রীহট্টবাসীব লিখিত গ্রন্থে যদি 'আমি ঐ কার্য্যটি করিতে পার্ত্তাম।।', এই বাক্যটী থাকে, তাহা হইলে

শ্রীহট্টবাসী উহাতে যাহা বুঝেন আমরা তাহা বুঝিব না, সম্পূর্ণ বিপরীত বুঝিব। কারণ 'করিতে পার্ত্তাম্ না' বলিলে আমরা বুঝি 'করিবার ক্ষমতা হইত না', কিন্তু শ্রীহট্টবাসী বুঝেন 'করিতে পারিব না'। শ্রীহট্টবাসী বলেন 'খাইমু', 'যাইমু', 'দিমু', 'আইঐন', আমরা বলি খাব,''যাব,''দিব','আসুন'। আমাদিগকে আমাদের নিজের অপভ্রংশাদির ব্যবহার করিতে দেখিয়া, শ্রীহট্টবাসীও যদি তাঁহার নিজের অপভ্রংশাদির ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তাঁহার লেখা আমরা বুঝিতে পারিব না। সুতরাং তাঁহার সাহিত্য আমাদের সাহিত্য হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িবে। এইরূপে বঙ্গের সকল জেলার লোকে যদি পুস্তকাদিতে আপন আপন অপভ্রংশাদির প্রয়োগ করে, তাহা হইলে বঙ্গে জেলাসংখ্যা যত, বাঙ্গালা সাহিত্যের সংখ্যাও প্রায় তত হইবে। অতএব লিখিবার সময় সকলেরই এরূপ অপভ্রংশ ও গ্রাম্যতা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। সাহিত্য সমস্ত সমাজের জন্য, খণ্ড সমাজের জন্য নহে, সমস্ত জাতির জন্য, স্থান বিশেষের অধিবাসীর জন্য নহে। উহাতে গ্রাম, মৌজা, মহকুমা বা জেলা

বিশেষের প্রচলিত শব্দ ব্যবহৃত হইলে, উহার যে প্রশস্ত জাতীয ভাব হওযা আবশ্যক তাহা হইতে পারে না, তৎপরিবর্ত্তে উহার একটা সঙ্কীর্ণ গ্রাম্য বা স্থানীয় ভাব জন্মিযা যায। সাহিত্য কি জিনিস, উহার মর্য্যাদা, পবিত্রতা, জাতি গঠন পক্ষে কার্য্য-কাবিতা কত, স্বেচ্ছাচাবিতাব প্রাবল্য বশতঃ তাহা ভুলিযা, আমবা গ্রাম্যতাদিব বহুল প্রযোগে বাঙ্গালা সাহিত্যকে কলঙ্কিত, সঙ্কুচিত এবং অরুচিকব কবিযা তুলিতেছি।

আরও এক কথা। যে শব্দেব অপভ্রংশ নানা আকার ধাবণ কবে, তাহার অপভ্রংশেব ব্যবহাব কোন স্থানেই সুবিধা জনক, সমতাসাধক ও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। নানা আকারেব মধ্যে সমস্ত লেখককে একটী নির্দ্দিষ্ট আকাব ব্যবহাব করাইবার জন্য কোন নিযমই নির্দ্ধারিত কবিযা দিতে পাবা যায না। এমন কি, একই লেখককে একটী নির্দ্দিষ্ট আকারের প্রযোগে আবদ্ধ করিতে পারাও কঠিন। উপরে যে কযটি উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে (১) ও (৪) একই লেখকেব রচনা হইতে গৃহীত। কিন্তু তিনি 'করিলাম' শব্দের পরিবর্ত্তে একই রচনার একস্থানে

'করলুম' আর এক স্থানে 'কল্লুম' প্রয়োগ করিয়াছেন। যখন এই সকল গ্রাম্যতাদির প্রয়োগে এক লেখকের ভাষায় সমতা রক্ষিত হওয়া কঠিন, তখন সমস্ত লেখকে এইরূপ প্রয়োগের পক্ষপাতী হইলে, ভাষার অসমতা জনিত বৈষম্যে বাঙ্গালা সাহিত্য কতই যে বিকৃত হইয়া উঠিতে পারে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু সাহিত্যের ভিতর বৈষম্য বাড়িলে, জাতির ভিতরও বৈষম্য বাড়ে।

কেহ কেহ বলেন যে জ্ঞান পণ্ডিতশ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া লোকসাধারণের মধ্যে প্রচারিত করা যখন সাহিত্যের একটা প্রধান উদ্দেশ্য, তখন পুস্তকাদির ভাষা যতদূর সম্ভব সরল করিবার জন্য গ্রাম্য শব্দাদির প্রয়োগ হওয়াই আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয়। সাহিত্যের মর্য্যাদা অমর্য্যাদার কথা ছাড়িয়া দিয়া বিচার করিলে, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে যে, যে লেখক ঐরূপ শব্দাদির প্রয়োগ করেন, ঐরূপ প্রয়োগে তাঁহার নিজের মৌজা মহকুমা বা জেলার লোক সাধারণের সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু ঐরূপ প্রয়োগে, অপর সমস্ত স্থানের লোক-সাধারণের যে অসুবিধা হওয়া সম্ভব, বোধ হয় ইহা

অস্বীকার করিতে পারা যায় না। সুতরাং একপ প্রয়োগে লোকসাধারণের উপকার অপেক্ষা অপকারের পরিমাণ অনেক বেশী হওয়াই সম্ভব। এক ব্যক্তির রচিত একখানি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থে চুল্লী শব্দের ব্যবহার করা হয়। লেখকের এক সম্ভ্রান্ত, সম্মানার্হ, মহাজ্ঞানী, নানা শাস্ত্রজ্ঞ বন্ধু বলেন যে, 'চুল্লী' শব্দের পরিবর্ত্তে 'উনুন' শব্দ ব্যবহার করিলে ভাল হইত। তিনি কোন হেতু নির্দ্দেশ করেন নাই। কিন্তু সম্ভবতঃ এই ভাবিয়া ঐ পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, 'উনুন' শব্দ যত লোকে জানে 'চুল্লী' শব্দ তত লোকে জানে না। আমাদের এই অঞ্চল সম্বন্ধে কথাটা ঠিক হইতে পারে, কিন্তু বঙ্গের বহুত্র স্থানে উনুন শব্দের ব্যবহার নাই। 'চুল্লী' বা 'চুলো' শব্দ বোধ হয় সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে। সুতরাং 'উনুন' শব্দ ব্যবহার করিলে যত লোকের বুঝিবার সুবিধা হয়, 'চুল্লা' বা 'চুলো' শব্দের ব্যবহারে তদপেক্ষা অনেক অধিক লোকের বুঝিবার সুবিধা হয়। সাহিত্য সমগ্র দেশের জন্য, দেশের অংশ বিশেষের জন্য নহে; সাহিত্য সমস্ত জাতির জন্য, স্থান বিশেষের অধিবাসীর

জন্য নহে, এ কথা যদি ভ্রম মূলক না হয়, তবে যেরূপ অপভ্রংশ ও গ্রাম্যতাদির কথা কহিতেছি, তাহার ব্যবহারে বাঙ্গালা রচনা দূষিত হইয়া পড়িতেছে এবং বাঙ্গালা সাহিত্য সাহিত্য নামের অযোগ্য হইতেছে ও সমস্ত সমাজের বা জাতির যে সকল বৃহৎ কার্য্য সাহিত্য দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে তাহা সাধন করিবার অনুপযোগী হইয়া উঠিতেছে, ইহা স্বীকার করিতেই হয়। গ্রাম্যশব্দাদির ব্যবহারের জন্য কেবল লোকশিক্ষার অসুবিধা হয় তাহা নহে, জাতীয় একতা বুদ্ধির উদ্রেক ও পরিবর্দ্ধনেরও ব্যাঘাত ঘটে। লেখকেরা আপন আপন জেলা বা দেশাংশের অপভ্রংশ ও গ্রাম্যতাদির ব্যবহারের পক্ষপাতী হইলে, সাহিত্যে সঙ্কীর্ণ স্থানীয় অনুরাগ ও অভিমানের নিদর্শন বেশী মাত্রায় অনুভূত ও লক্ষিত হওয়ায়, দেশের লোকের মনে পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য জ্ঞানই প্রবল ও পরিপুষ্ট হইতে থাকে, সুতরাং একতা জ্ঞানের উন্মেষের ব্যাঘাতই হয়। ফলতঃ যেখানে আপন আপন দৃষ্টি, আপন আপন বিশেষত্বের সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া সমস্ত জাতির অবাধ বিস্তৃতির দিকে ধাবিত হয় নাই, সেই খানেই সাহিত্যে সঙ্কীর্ণ

প্রয়োগের বাহুল্য এবং উদার ও উন্মুক্তভাবের অভাবে সাহিত্য সেই খানেই সাহিত্য নামের অযোগ্য। এক্ষণকার বাঙ্গালা সাহিত্য একটী সাহিত্য নহে, নানা স্থানের নানা বিশেষত্ব দূষিত বহু সাহিত্যের সমষ্টি। একপ সাহিত্য যাহাদেব, সাহিত্যের গুণে তাহাদেব মধ্যে একস্তাব ভাব উদ্রিক্ত ও পবিবর্দ্ধিত হইতে পাবা দূবে থাকুক, পার্থক্যেব ভাবই প্রবল হয়। গ্রাম্যতাদিব প্রযোগের জন্য এই গুরুতর অনিষ্ট যে পরিমাণ ঘটিতেছে তাহার হ্রাস করা বেশী কঠিন নহে। যাচ্চি, কচ্চি, খাচ্চি না লিখিযা যাইতেছি, কবিতেছি, খাইতেছি লিখিতে কেবল একটু ইচ্ছার প্রযোজন। আমাদের দৃষ্টি যেরূপ আত্মনিবদ্ধ, তাহাতে ঐ ইচ্ছাটুকু হওযাও কিছু কঠিন বটে। কিন্তু ইচ্ছা হইলে লিখিবার অন্য বাঁধা থাকিবে না।

বাঙ্গালা সাহিত্য আব এক প্রকারে আমাদেব মধ্যে পার্থক্যের ভাব প্রবল কবিযা একতা বুদ্ধি উদ্রেকেব ব্যাঘাত ও বিলম্ব ঘটাইতেছে। অনেক স্থলে পূর্ব্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের লিখিবাব ধারা এক নহে, বিভিন্ন। পূর্ব্ব বঙ্গের লোকে লেখে—এ

কার্য্যটী না করিয়া পারি না ; পশ্চিম বঙ্গের লোকে লেখে—এ কার্য্যটী না করিয়া থাকিতে পারি না। পূর্ব্ব বঙ্গের লোকে লেখে—তিরস্কৃত হইয়া তিনি নীরব রহেন। পশ্চিম বঙ্গের লোকে লেখে—তিরস্কৃত হইয়া তিনি নীরব থাকেন। পূর্ব্ববঙ্গের লোকে লেখে—প্রায় লোকে তীর্থযাত্রা করিয়া থাকে ; পশ্চিম বঙ্গের লোকে লেখে—প্রায় সকল লোকে তীর্থযাত্রা করিয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের লেখায় এইরূপ আর ও অনেক প্রভেদ বা পার্থক্য দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ প্রভেদ এত বেশী যে, পূর্ব্ব বঙ্গের অনেক প্রধান প্রধান লোকে বিবেচনা করেন যে, তথাকার লেখকদিগের প্রণীত স্কুলপাঠ্য পুস্তকের সুবিচার কলিকাতাস্থিত সেণ্ট্রাল টেকস্ট্বুক কমিটি কর্ত্তৃক হইতে পারে না। এবং সেই জন্য তাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গের লোক লইয়া ঢাকা নগরীতে একটী স্বতন্ত্র টেকস্ট্বুক কমিটি গঠিত করাইবার জন্য একাধিক বার শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেন। ইহাও শুনিয়াছি যে, স্যর আণ্টনি ম্যাকডনেল্ মহোদয় যখন কিছু দিনের জন্য বঙ্গের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, তখন একবার পূর্ব্ববঙ্গ হইতে

ঐরূপ নিবেদন আসিযাছিল। কিন্তু তিনি এই বলিযা উহা অগ্রাহ্য কবিযাছিলেন যে, একই দেশের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগেব নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন পাঠ্য নির্ব্বাচনী সমিতি স্থাপিত হওযা বাঞ্ছনীয নহে। একই দেশেব বা একই জাতির সাহিত্যে এ প্রকাব প্রভেদ বা পার্থক্য থাকাব অর্থ এই যে, সাহিত্য প্রকৃত জাতীয ভাব ধারণ করে নাই, জাতিব ভিতব একতা জন্মে নাই বলিযা সাহিত্যও একতাসূচক হইতে পারে নাই। প্রকৃত পক্ষে, পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গেব মধ্যে মনেব অসদ্ভাবও যথেষ্ট দৃষ্ট হয। পূর্ব্ব বঙ্গবাসী-দেব মনে বেশী অসদ্ভাব কি পশ্চিম বঙ্গবাসীদেব মনে বেশী অসদ্ভাব, সে কথাব উল্লেখ বা আলোচনা নিষ্প্রযোজন। এস্থলে ইহাই বক্তব্য যে, একই দেশেব লোকেব মনে পরস্পবেব সম্বন্ধে কোন প্রকাব অসদ্ভাব থাকা যাব পব নাই দোষাবহ, শোচনীয, এবং অনিষ্টকব। যাহাদেব মধ্যে এরূপ অসদ্ভাব থাকে, তাহাদেব মধ্যে একতাব ভাব জন্মিতে পারে না, এবং তাহাদেব সাহিত্য প্রকৃত সাহিত্যেব ন্যায তাহাদেব ভিতব সদ্ভাব ও সৌহার্দ্দ বৃদ্ধি না করিযা, অসদ্ভাব ও অসূয়াই বাড়াইযা দেয।

কোন বাঙ্গালা পুস্তকে 'এ কথা না কহিয়া পারি না' অথবা 'তিনি লোকের কাণ কথা ধরিয়া কার্য্য করেন' অথবা এইরূপ আর একটা কিছু দেখিলেই, এ অঞ্চলের লোকে বিদ্রূপ করিয়া উঠেন। সুতরাং বাঙ্গালা সাহিত্য পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অসদ্ভাব বাড়াইয়া দিতেছে, অন্ততঃ কমিতে দিতেছে না। এরূপ সাহিত্য সাহিত্যই নহে। সাহিত্য সমাজ বাঁধিবে, জাতি গড়িবে—সদ্ভাব বৃদ্ধি করিবে, বিরোধ বিদ্বেষ বিদূরিত করিবে—পার্থক্য জ্ঞান নষ্ট করিয়া একতার ভাব ফুটাইয়া ফলাইয়া দিবে। তবেই সাহিত্য সাহিত্য নামের যোগ্য হইবে—প্রকৃত সাহিত্যের উচ্চ পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই মহৎ কার্য্য সাধন করিতে হইলে, এই মহতী প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইতে হইলে, সাহিত্যকে স্থানীয় কারণজাত সমস্ত অনিষ্টকর বিশেষত্ব ও বিভিন্নতা পরিহার করিয়া, একটা সুনির্ম্মিত সুন্দর সমতাময় আকার ধারণ করিতে হইবে। কথার সমতায় মনের সমতা আনিয়া দেয়। দর্শনেন্দ্রিয়কে যে চোক্ বলে, তাহাকে আপনার বলিয়া মনে হয়, যে আঁখ বলে তাহাকে যেন একটু পর বলিয়া বোধ

হয়। যাহাদের কথা বা ভাষা এক নয়, তাহাদের মনে মনে তেমন মিল হয় না, তাহারা এক জাতি হইতে পারে না। পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের কথায় এখন সম্পূর্ণ সমতা নাই, সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মনেরও সমতা নাই। দুইটী বিভাগের ভাষা যেন এক নয়; বলিতে বড় দুঃখ হয়, দুইটী বিভাগের লোকেও যেন দুইটী জাতির ন্যায় হইয়া আছে। দুইটী বিভাগের কথার সম্পূর্ণ সমতা হইলে, সেই সমতার ফলস্বরূপ ক্রমে ক্রমে দুইটী বিভাগের মনেরও সমতা হইয়া, সমস্ত বাঙ্গালীর মধ্যে একতার ভাব উদ্রিক্ত হইয়া কালে প্রবল হইয়া উঠিবে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই—পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে কথার এই সমতা কি প্রকারে সাধন করা যায়। সাধন করিবার একমাত্র সদুপায় আছে—পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গে যে দুইটি বিভিন্ন বাগ্‌ধারা (Idiom) আছে, তন্মধ্যে একটীকে ছাড়িয়া দিয়া অপরটীকে সর্ব্বত্র প্রচলিত করা। এখন কথা হইতেছে—কোন্‌টীকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে? আপনার বাগ্‌ধারা প্রভৃতি ছাড়িয়া দিয়া অন্যের বাগ্‌ধারা প্রভৃতি

গ্রহণ করিতে মনঃকষ্টও হয, চিরন্তন অভ্যাস ত্যাগ করিবাব যে কষ্ট সে কষ্টও হয। সুতরাং এ প্রশ্নের মীমাংসা যদি আমাব নিজেব ইচ্ছাব উপর নির্ভর কবিত, তাহা হইলে ইহাব এই মীমাংসা করিতাম যে, আমবা পশ্চিম বঙ্গবাসী, আমবাই আমাদের নিজেব ধাবা ছাড়িযা দিযা আমাদের পূর্ব্ববঙ্গবাসী ভ্রাতাদিগকে কষ্ট হইতে অব্যাহতি দিই। কিন্তু এরূপ প্রশ্নেব মীমাংসা মীমাংসা-কাবীব আপন ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি মত হইতে পাবে না, সর্ব্ব সাধারণেব সুবিধা অসুবিধা বিবেচনানুসাবে কবিতে হয। যে ধাবাটী ছাড়িযা দিলে স্বল্পতর লোকেব কষ্ট, সেইটী ছাড়াই যুক্তি সঙ্গত; যে ধাবাটী ছাড়িযা দিলে অধিকতব লোকেব কষ্ট, সেইটী বাখিযা দেওযাই যুক্তিযুক্ত। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টেব বেঙ্গল লাইব্রেবী নামক পুস্তকাগাবেব পুস্তকতালিকা দৃষ্টে জানা যায যে, প্রতি বৎসব বঙ্গদেশেব সমস্ত বিভাগে যত পুস্তক প্রকাশিত হয, এক বৃটিশ ভাবতবর্ষেব রাজধানী কলিকাতায় তাহার আড়াই গুণেবও অধিক প্রকাশিত হয। বিগত ইংরাজী ১৮৯৭ সালে ভাগলপুব, বর্দ্ধমান,

চট্টগ্রাম, ছোটনাগপুর, ঢাকা, প্রেসিডেন্সী ও রাজ-সাহী, এই সমস্ত বিভাগে ৪৪৪ খানার বেশী পুস্তক প্রকাশিত হয নাই; কিন্তু এক মহানগরী কলিকাতাতে ১০৬২ খানা পুস্তক প্রকাশিত হইযা-ছিল। আবাব পূর্ব্ববঙ্গেব ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগেব পুস্তক সংখ্যাব সহিত পশ্চিম বঙ্গেব ভাগলপুব, বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগ ও বাজ ধানী কলিকাতাব পুস্তক সংখ্যাব তুলনা কবিলে দেখা যায যে, ১৮৯৭ সালে পূর্ব্ববঙ্গে ২২০খানি মাত্র পুস্তক প্রকাশিত হয, কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে ১২৪২ খানা প্রকাশিত হয। সুতবাং পূর্ব্ব বঙ্গকে আপন ধাবা ছাড়িতে হইলে যত লেখককে নূতন ধাবা শিখিবাব কষ্ট পাইতে হইবে, পশ্চিম বঙ্গকে আপন ধাবা ছাড়িতে হইলে তদপেক্ষা অনেক অধিক লোককে নূতন ধাবা শিখিব'ব কষ্ট পাইতে হইবে। অতএব পূর্ব্ব বঙ্গেরই আপন ধাবা ছাড়িযা পশ্চিম বঙ্গেব ধাবা গ্রহণ কবা কর্ত্তব্য। আবাব কলিকাতা এখন বঙ্গেব বাজধানী। এ জন্যও পশ্চিম বঙ্গেব ভাষাই সমস্ত বাঙ্গালীব আদর্শ ভাষা হওযা উচিত। মহাবাজ কৃষ্ণচন্দ্রেব সময়ে নদীযার ভাষাই বঙ্গে আদর্শ ভাষা

বলিযা গণ্য হইত। অতএব কলিকাতার ভাষাকে এখন বঙ্গের আদর্শ ভাষা জ্ঞান করিলে, আমাদের রীতি ও ইতিহাস সঙ্গত কার্য্যই করা হইবে। সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গ যদি কলিকাতার ভাষাকে আদর্শ ভাষা বলিযা স্বীকার করেন এবং তাহারই রীতি পদ্ধতি অনুসরণ করেন, তাহা হইলে গৌরবহানি বা হীনতা ঘটিল ভাবিযা তাঁহার মনঃকষ্ট পাইবারও কারণ থাকিবে না। রাজধানীর সম্মান সকল দেশেই আছে, সকল লোকেই করে। বাঙ্গালা সাহিত্যকে প্রকৃত সাহিত্যে পরিণত করিতে হইলে, বাঙ্গালীর মধ্যে বিরোধ,বিদ্বেষ ও ঘৃণার হেতু-ভূত করিযা না রাখিযা, উহাকে সমস্ত বাঙ্গালী জাতির একতা সাধক শক্তি করিযা তুলিতে হইলে, পূর্ব্ব-বঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, সমস্ত বঙ্গকে একই ভাষায কথা কহিতে হইবে। একই জাতির মধ্যে ভাষার প্রভেদ, সাংঘাতিক প্রভেদ : ও প্রভেদ আমাদিগকে তুলিযা দিতেই হইবে। ও প্রভেদ তুলিযা দিতে সময আবশ্যক, অনেককে অনেক কষ্টও পাইতে হইবে। বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি, সকলকে সে কষ্ট পাইতে হইবে না বলিয়া,

যাঁহার সে কষ্ট স্বীকার না করিলে নহে, তাঁহার যেন বাঙ্গালা সাহিত্য ও বাঙ্গালী জাতির এই মহোপকার সাধন করিতে প্রবৃত্তির অভাব না হয়।

এই সংস্কার সাধন করিতে হইলে অগ্রে পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ প্রভৃতি স্থানের ভিন্ন ভিন্ন বাগ্‌ধারাদি সংগ্রহ করিয়া একখানি পুস্তক প্রস্তুত করা আবশ্যক। মৃত আনন্দরাম বড়ুয়া মহাশয় এইরূপ সংগ্রহ করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। বোধ হয় তাঁহার প্রস্তাবটী গবর্ণমেণ্টের গোচরীভূতও করিয়াছিলেন। কিন্তু কাল তাঁহাকে অকালে লইয়া গিয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ তাঁহার প্রস্তাবিত কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবেন না কি? কার্য্যটী পরিষদেরই ত করণীয়।

এইবার বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের আর একটী লক্ষণের উল্লেখ করিব। জেলা ভেদ বা বঙ্গের পূর্ব্ব পশ্চিম ভেদ, সে লক্ষণের হেতু নহে। সে লক্ষণের হেতু আমাদের ইংরাজী শিক্ষা। আমরা বাঙ্গালা বা সংস্কৃত অপেক্ষা ইংরাজী লেখা পড়া বেশী করি। এই কারণে আমরা যে বাঙ্গালা লিখি তাহা অনেক স্থলে বাঙ্গালা হয় না, ইংরাজী হইয়া পড়ে। গুটিকতক উদাহরণ দিতেছি।—

(১) আমরা নিরুপায ভাবে ইংরাজের হস্তগত হইয়াছি।

(২) এই উভযেব মধ্যে কেবলমাত্র মাত্রার প্রভেদ বকমের প্রভেদ নয।

(৩) তৈত্তিরীয উপনিষদের এই উক্তি ভক্তিপ্রধান পৌরাণিক সময়কে আলিঙ্গন কবিতেছে।

(৪) ঐ যে যুবক ঘোডায চড়িযা আসিতেছে উহার প্রতি অঙ্গে উচ্চ কুলশীল নিথাত।

(৫) বুদ্ধি ভোজ্য লাভ করে।

(৬) অভিমানী, কাপুরুষেব মত অন্ধকারে আঘাত কবিতে জানে না।

(৭) পৃথিবীতে পৃথিবী প্রবল হইবারই কথা, স্বর্গ সর্ব্বদা কেমন করিয়া দেখিতে পাওয়া যাইবে?

(৮) কাজের সুবিধার জন্য ভাব গৌরবকে বলিদান দিতে তাঁহাদের অনেকে কুণ্ঠিত হন না।

(৯) উপকারের নামে যাহারা অপকার ঘটায়, তাঁহারা ধর্ম্মনীতির অভিসম্পাত।

(১০) আমরা এক কালে এত বড় ছিলাম যে ইউরোপের অত বড় হইবাব সম্ভাবনা অতি ভগ্নাংশিক।

(১১) তাঁহার মহৎ মন এরূপ নীচাশয়তার অনেক উপরে বাস করিত।

(১২) গবর্ণরজেনবল বাহাদুর এই কারণ বশতই উপস্থিত জুরি বিল হইতে নিজের হস্ত প্রক্ষালন করিয়াছেন।

(১৩) গাছকাটা, চাষকরা প্রভৃতি কার্য্য পর্য্যায়-ক্রমে ইহাঁদের দৈনিক জীবন ব্যাপ্ত করিত।

(১৪) একমাত্র শৃগালের রব সেই নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে।

(১৫) এরূপ কথা মানিয়া লওয়ার পূর্ব্বে দুইবার চিন্তা করা আবশ্যক।

(১৬) লোকনিন্দায় তাহারা যেরূপ নিকৃষ্ট প্রফুল্লতা প্রদর্শন করে।

(১৭) একটী সূচের অগ্রভাগে দুইটী স্বর্গীয় দূত দাঁড়াইতে পারে না।

(১৮) তখন লজ্জা আসি সুন্দরীর গালে আঁকিল গোলাপ।

(১৯) প্রতিযোগিতার দিনে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন স্বাভাবিক নিয়ম।

(২০) যাঁহারা এই অনন্ত কাল সমুদ্রের সৈকত

ভূমিতে আপনাদিগের পদ-চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন।

(২১) বস্‌ওয়েল জন্‌সনের আত্মার ভারে একেবারে অভিভূত ছিলেন।

(২২) তাঁহার স্বাভাবিক বুদ্ধি জনসনের নিকটবর্ত্তী হইলেই স্তম্ভিত হইত।

(২৩) পৃথিবীর অধিকাংশ মনুষ্যই অবস্থার পূজা করে।

(২৪) তাহাদের দেহের পুষ্টি মুষ্টির অগ্রভাগে আমাদের নাসার সম্মুখে সর্ব্বদাই উদ্যত হইয়া আছে।

(২৫) অবিমিশ্র উত্তম কিছুই থাকিতে পারে না।

(২৬) সভ্যতার মধ্যে সেই জাগ্রত শক্তি আছে যাহা আমাদের মনের স্বাভাবিক জড়ত্বের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করিবার জন্য আমাদিগকে উৎসাহিত করে, যাহা আমাদিগকে কঠিন প্রমাণের উপর বিশ্বাস করিতে বলে, যাহা আমাদিগকে শিক্ষিত রুচির দ্বারা উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত করে, যাহা আমাদিগকে পরীক্ষিত যোগ্যতার নিকট ভক্তি

নম্র হইতে উপদেশ দেয, যাঁহা এইরূপে ক্রমশঃই আমাদের সচেষ্ট মনকে নিশ্চেষ্ট জড় বন্ধনের জাল হইতে উদ্ধার করিতে থাকে।

যে স্বল্প সংখ্যক বাঙ্গালী ইংবাজী শিখিয়াছেন, তাঁহারা এরূপ বাঙ্গালা বুঝিলেও বুঝিতে পারেন, অনেক স্থলে তাঁহারাও বুঝিতে পারেন কি না সন্দেহ। কিন্তু যে কোটি কোটী বাঙ্গালী ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ, তাঁহারা যে ইহা বুঝিতে সম্পূর্ণ অক্ষম, তদ্বিষযে কিছুমাত্র সন্দেহ হইতে পাবে না। সুতরাং এখনকাব বাঙ্গালা সাহিত্যেব যে অংশ এই প্রকারে লিখিত, তাহা পাঠ করিলে বঙ্গের লোকসাধারণের কোন জ্ঞানই লাভ হয় না, কোন উপকাবই হয না। অতএব তাঁহাদের সম্বন্ধে উহা থাকা না থাকা সমান। একথার অর্থ এই যে, ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী যে সাহিত্য প্রস্তুত করিতেছেন তাহা বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্য নহে—যে অসংখ্য অগণিত লোক লইয়া বাঙ্গালী জাতি, সে সাহিত্যে তাঁহাদের প্রবেশাধিকার নাই। চিকিৎসা শাস্ত্র, ব্যবহার শাস্ত্র প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ শাস্ত্র ছাড়া, সাহিত্য প্রধানতঃ সর্ব্বসাধারণের

পাঠ্য। সুতরাং সাহিত্য যত অধিক লোকের উপযোগী হয, উহার সঙ্কীর্ণ বা সাম্প্রদাযিক ভাব নষ্ট হইযা জাতীয ভাব তত প্রবল হয এবং উহার সাহিত্য নামও তত সার্থক হইতে থাকে। যে সাহিত্য কেবল বিশেষ প্রণালীতে শিক্ষিত শ্রেণী বিশেষের উপযোগী, তাহা জাতীয সাহিত্য নহে, সাম্প্রদাযিক সাহিত্য। জ্ঞানবিস্তার ও জাতীয একতা সাধনরূপ যে মহৎ কার্য্য প্রকৃত সাহিত্যের দ্বারা সম্পাদিত হয, উহা দ্বারা তাহা সম্পাদিত হইতে ত পারেই না, অধিকন্তু উহাব প্রভাবে সমাজের শ্রেণী বিশেষ লোক সাধারণেব সম্বন্ধে সহানুভূতি শূন্য হইযা, সমাজের ভিতব একটা বিষম অনিষ্ট-কাবী পার্থক্যেব সূত্রপাত কবিয়া, তাহার পবিবর্দ্ধন সাধন কবিতে থাকেন। বস্তুতঃ বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের যে লক্ষণেব কথা কহিতেছি, স্বদেশের লোক সাধারণের সম্বন্ধে অবজ্ঞা, অনাস্থা ও সহানুভূতিশূন্যতাই তাহাব উৎপত্তির অন্যতম কাবণ এবং প্রবলতার প্রধান হেতু। কিরূপ ভাষায ও ভঙ্গিতে লিখিলে আমাদেব আপন আপন মনস্তুষ্টি হয়, লিখিবার সময আমাদেব কেবল সেই দিকে দৃষ্টি

থাকে, আমাদেব লেখা পড়িতে অপবেব বিবক্তি বা বুঝিতে কষ্ট হইবে কিনা, সে কথাটা বোধ হয আমাদেব মনে একেবারেই উদয হয না। অপরে পড়িযা শিক্ষা লাভ কবিবে, এই অভিপ্রাযে আমবা যে সকল স্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখি, তাহাও অনেক স্থলে কেবল আমাদেব আপনাব আপনার সন্তোষ-জনক করিযা লিখি, যাহারা পড়িবে তাহাদেব উপযোগী কবিযা লিখিতে পাবি না। আমাদেব দৃষ্টি এতই সঙ্কীর্ণ, আমাদেব মন এতই আত্মনিবদ্ধ। আমবা অন্যের ভাবনা ভাবিতেই পারি না। সহানু-ভূতি জিনিসটা আমাদেব থাকিতেই পাবে না। আমবা স্বদেশানুবাগ বা স্বদেশবাসীব সহিত সহানুভূতিব যতই আস্ফালন কবি না কেন, প্রকৃত পক্ষে দুইযের একটাও আমাদেব নাই। বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য যে প্রকৃত সাহিত্য নহে, উহা যে জাতীয ভাবে গঠিত ও অনুপ্রাণিত হইতেছে না, উহা যে একতা সাধন পক্ষে সাহায্য না করিযা আমাদের ভিতর বিরোধ, বিদ্বেষ, বৈষম্য বাডাইতেছে ও পার্থক্যের পরিপুষ্টি সাধন করিতেছে, ইহাই তাহার একটী প্রবল কাবণ। সাহিত্যে মানুষ গড়ে,

সমাজ গড়ে, জাতি গড়ে সত্য; কিন্তু মানুষে সাহিত্য না গড়িলে, সাহিত্য ও কিছুই গড়িতে পারে না। স্বার্থান্বেষী স্বেচ্ছাচারী দ্বারা সাহিত্য গঠিত হওয়া অসম্ভব।

যে ভাষার অধিক অনুশীলন করা যায়, সে ভাষার ধারাধরণ অনেকটা আয়ত্ত হইয়া উঠে এবং উহার প্রয়োগ কিয়ৎ পরিমাণে স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য হইয়া থাকে। আমরা ইংরাজীর অধিক অনুশীলন করি বলিয়া, আমাদের বাঙ্গালা অনেক স্থলে ইংরাজী রকমের বাঙ্গালা হইয়া পড়ে। সুতরাং এ দোষের সংস্কার কিছু কঠিন। কিন্তু ইচ্ছা অথবা প্রতিজ্ঞা করিলে, এ দোষেরও সংস্কার যে না হয় তাহা নহে। লিখিবার সময় দুইটী কথা মনে রাখিলে, এ দোষ ক্রমে কমিয়া যাইতে পারে। একটী কথা এই যে, আপন ভাষায় লিখিতে হইলে, আপন ভাষার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া লেখা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। যাহা আপন ভাষার প্রণালীতে ব্যক্ত করিতে পারা যায়, তাহা অপরের ভাষার প্রণালীতে ব্যক্ত করিলে, আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান ও মনুষ্যত্ব, এই দুইয়ের অতি শোচনীয় ও লজ্জাকর অভাব প্রদর্শন

করা হয়। ইংরাজ অপরের প্রণালীতে ইংরাজী লিখিতে ঘৃণা বোধ করেন; অপরকে ইংরাজী হইতে ভিন্ন প্রণালীতে ইংরাজী লিখিতে দেখিলে, কতই উপহাস করেন। ইংরাজ মানুষ, ইংরাজের আত্মমর্য্যাদা বোধ আছে। বাঙ্গালা ভাষা দরিদ্র হইলেও, এত দরিদ্র নহে যে, ইংরাজী রকমে বাঙ্গালা না লিখিলে চলে না। 'আমরা নিরুপায় ভাবে ইংরাজের হস্তগত' একথার যে অর্থ, 'ইংরাজ আমাদিগকে এমনই হস্তগত করিয়াছেন যে আমাদের উদ্ধারের আর উপায় নাই', এ কথার ও কি সেই অর্থ নহে? 'ঐ যুবকের প্রতি অঙ্গে উচ্চ কুলশীল নিখাত' এই কথার অর্থ, এবং 'ঐ যুবক যে উচ্চ কুলশীল সম্পন্ন উহার দেহের যে কোন অঙ্গ দেখিলে তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ থাকে না' এই কথার অর্থ কি এক নয়? আর একটী কথা এই যে, লেখা কেবল লেখকের নিজের সক মিটাইবার বা মনস্তুষ্টির জন্য নহে। লেখা প্রধানতঃ পরোপকারার্থ, অর্থাৎ, অপরে পড়িয়া উপকৃত হইবে বলিয়া। অতএব যে প্রণালীতে লিখিলে অপরে লেখা বুঝিতে পারিবে না, সে প্রণালীতে লিখিতে নাই, লিখিলে সহৃদয়তা,

সহানুভূতি ও স্বদেশীয়ের প্রতি অনুরাগের সম্পূর্ণ অভাব প্রকাশ পায়। 'যুবকের প্রতি অঙ্গে উচ্চ কুলশীল নিখাত' যে কযজন বাঙ্গালী ইংবাজী জানেন তাঁহারা এ কথাব অর্থ বুঝিলেও বুঝিতে পাবেন। কিন্তু যে অসংখ্য বাঙ্গালী ইংরাজী জানেন না, তাঁহারা এ কথার কোন অর্থই করিতে পারিবেন না। কেবল মাত্র আপনার অথবা আপনারই ন্যায় দুই চাবি জনের তৃপ্তিব উপর দৃষ্টি রাখিযা না লিখিযা, যে অগণ্য স্বদেশবাসী আপনার ন্যায় নহেন তাঁহাদের হিতাহিতের প্রতি দৃষ্টি রাখিযা লিখিলে, এরূপ লেখা অসম্ভব হইযা পড়ে। এই দুইটী কথা মনে বাখিযা লিখিবাব চেষ্টা করিলে আমাদের মহদুপকাব সাধিত হইবে। আমাদেব আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান ক্রমে বাড়িতে থাকিবে। আমাদেব আত্মনিবদ্ধতা কমিযা সহৃদযতা, সহানুভূতি ও স্বদেশানুবাগ বাড়িতে থাকিবে। বাঙ্গালা সাহিত্য লোকশিক্ষার অন্তরায় না হইয়া, সুশিক্ষা প্রচারে বহুল পবিমাণে সহাযতা করিবে, এবং সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভাব পবিত্যাগ করিয়া প্রশস্ত জাতীয় ভাব ধারণ করিবে। যে দিন বাঙ্গালা সাহিত্যকে প্রকৃত সাহিত্য করিয়া তুলিতে পাবিব, সেই

দিন দেখিতে পাইবে যে, সাহিত্য মানুষ গড়িযাছে, সমাজ বাঁধিয়াছে। সেই দিন বুঝিতে পারিব, সাহিত্য অবলম্বন কবিযা মানুষ কত উচ্চে উঠিতে পারে। সাহিত্যেব কত শক্তি, সাহিত্য কত মহৎ, কত কঠিন কার্য্য সাধন করিতে পাবে—সেই দিন তাহাব পূর্ণ উপলব্ধি হইবে।

ইংরাজী শিক্ষাব ফলে বাঙ্গালা রচনাব যে বিকৃতি ঘটে, তাহা নিবাবণ কবিবাব আব একটী উপাযেব উল্লেখ কবিলে ক্ষতি নাই। মানুষ যেরূপ হইতে চেষ্টা ও যত্ন কবে, সেইরূপ হইযা থাকে। মন্দ লোকে ভাল হইবাব চেষ্টা কবিলে ভাল হয়। ভাল হইলে তাহাব কুপ্রবৃত্তিগুলি বিলুপ্ত হয, সে আব মন্দ কাজ কবিতে পাবে না। বাঙ্গালী ইংবাজ হইবাব চেষ্টা কবিলে, ইংবাজ হইযা যায না বটে, কিন্তু অনেকটা ইংবাজেব ন্যায হয়। তখন তাহাব বাঙ্গালীত্ব কতকটা বিলুপ্ত হইযা যায এবং সে বাঙ্গালীব ন্যায আচরণ করিতে কিযৎ পবিমাণে অক্ষম হইযা পড়ে। বাঙ্গালী যদি ইংরাজের ন্যায ইংবাজী লিখিবাব জন্য অতিবিক্ত চেষ্টা করেন, তাহা হইলে ইংরাজের ন্যায নিখুঁত বা নির্দ্দোষ

ইংবাজী লিখিতে পারুন আর নাই পারুন, যে মানসিক ধাতু বা মনের ভাব প্রকাশ করিবার রীতি হইতে ইংরাজের ইংবাজী বচনার বিশেষত্ব উদ্ভূত হয, তাঁহাতে তাহা সংক্রমিত হইযা যায এবং তিনি বাঙ্গালীব ন্যায বাঙ্গালা বচনা কবিতে অক্ষম হইযা পড়েন। ইংবাজেব মানসিক ধাতু প্রাপ্ত না হইলেও, ইংবাজী রচনাব বিশেষত্বেব প্রতি অত্যধিক দৃষ্টি বাখিবাব ফলে, ঐ বচনার রীতি তাঁহাব এতই অভ্যস্ত ও প্রিয হইযা থাকে যে, আপন ভাষায বচনা কবিতে তাঁহার প্রবৃত্তিই হয না ; এবং প্রবৃত্তি হইলেও, ইংবাজী বচনাব প্রণালীতে আপন ভাষায বচনা কবা ভিন্ন তাঁহাব গত্যন্তর থাকে না। ইংবাজী বচনায সুনিপুণ আমাদেব এমন দুই এক জন পরলোকগত মহাত্মার বাঙ্গালা বচনায একথার জাজ্বল্যমান প্রমাণ বহিযাছে। কিন্তু ইংরাজী সাহিত্য ও বচনাব এত পক্ষপাতী হইলে, অধিকাংশস্থলে বাঙ্গালীব আপন ভাষায লিখিবার প্রবৃত্তিই হয না। যে দুই এক জন মৃত মহাত্মার উল্লেখ করিলাম তাঁহাদেব সময়ে তাঁহাদেব ন্যায বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রতিভা সম্পন্ন আরও কতকগুলি বাঙ্গালীর অভ্যুদয়

হইযাছিল। ইংবাজী রচনায তাঁহারাও সুনিপুণ ছিলেন। ইংরাজের ন্যায ইংবাজী লেখা জীবনের শ্রেষ্ঠতম কার্য্য, তাঁহাদের অনেকেব এইরূপ ধাবণা ছিল। এই কার্য্য তাঁহারা প্রাণপণেই কবিযা গিযাছেন। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয,ইহাতে কোন ফল হয নাই। তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থাদিতে ইংরাজী সাহিত্যেব গৌরব বা সমৃদ্ধিও কিছু মাত্র বর্দ্ধিত হয নাই; ইংবাজী লেখক বলিযা তাঁহাদের যশও, কি ইংবাজ কি বাঙ্গালী, কাহাবই মধ্যে স্থায়িত্ব লাভ কবিতে পারে নাই। বাঙ্গালী এখন তাঁহাদেব ইংরাজী রচনার কথা ভুলিযা গিযাছে। তাঁহাদেব পবেও অনেকে নিখুঁত ইংরাজী লিখিবাব জন্য প্রাণান্ত কবিযাছেন। কোন্ ইংরাজ গ্রন্থকার কোথায় কোন্ শব্দেব কেমন প্রযোগ কবিযাছেন, কোথায় ‘ the ’ শব্দ ব্যবহার করিলে দুবপনেয কলঙ্ক হয়, কোথায় ‘ the’ শব্দ ব্যবহাব না করিলে মার্কিণত্ব বা স্কচত্ব বা আইরিষত্ব বা বাঙ্গালীত্ব প্রকাশ পায, এই সকল নিরূপণে তাঁহারা সদাই ব্যস্ত, এই ভাবনায তাঁহাবা নিযতই আকুল। তাঁহাদেব রচনায সমান্য একটু ত্রুটী ঘটিলে তাঁহাদের দশ দিন আহার নিদ্রা হয় না,

বৃশ্চিক দষ্টের ন্যায তাঁহারা ছট্ ফট্ করিযা বেড়ান, মনে করেন—লোকে আমাদিগকে কি মূর্খ, কি অপদার্থ ই ভাবিতেছে, এমন লজ্জার কথা আর কি হইতে পারে? তাঁহারা যথার্থই রোগগ্রস্ত। তাঁহাদিগের ইংবাজী বচনাব অভিমানাদি দেখিলে দুঃখ হয, এবং সেই অভিমান জনিত স্পর্দ্ধাদিব আতিশয্য দেখিলে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইযা পড়ে। বিদেশীয ভাষায রচনা নৈপুন্য লাভ কবা মন্দ, এমন কথা বলি না। লাভ কবা হয, ভালই, কিন্তু লাভ কবাকে চতুর্ব্বর্গ লাভেব তুল্য জ্ঞান করিযা, তদর্থে প্রাণপাত কবা, বিশেষ বুদ্ধিমত্তাব ও স্বদেশ প্রিযতার কার্য্য বলিযা বিবেচনা কবা যাইতে পাবে না। অনেক ইংরাজ সংস্কৃত শিক্ষা কবেন, সংস্কৃতে পাণ্ডিত্যও লাভ কবেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে সংস্কৃতে উৎকৃষ্ট রচনা করিবাব প্রযাসী দেখা যায না। সম্প্রতি কলিকাতার একটী সভায সংস্কৃতে একটী বক্তৃতা প্রদত্ত হইযাছিল। সভাপতি অক্সফোর্ড বিশ্বাবিদ্যালযের প্রসিদ্ধ সংস্কৃতাধ্যাপক বেণ্ডল মহোদয রক্তৃতান্তে বলিযাছিলেন—'আমি সংস্কৃতে বক্তৃতা কবিব না। সংস্কৃতে কখনই ভাল বক্তৃতা কবিতে পারি না।'

ফলতঃ যে সকল ইংবাজ বা ইউবোপীয সংস্কৃত শিক্ষা করেন, তাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্য হইতে জ্ঞান সংগ্রহ কবিবাব নিমিত্তই উহা শিক্ষা কবেন, সংস্কৃত লেখক বলিযা সুখ্যাতি লাভের প্রযাসী হযেন না এবং প্রযাসী হওযাও বোধ হয সুবুদ্ধিব কাজ মনে কবেন না। যে সকল ইংবাজ বাঙ্গালা শিক্ষা কবেন, তাঁহাদেব সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা বলা যাইতে পাবে। বিবি নাইট ইংবাজীতে বিষবৃক্ষেব অনুবাদ কবিযাছেন—ইচ্ছা, ঐ গ্রন্থে বাঙ্গালীব দাম্পত্যপ্রণযেব যে চিত্র আছে তাহা স্বজাতীযদিগকে দেখান। কিন্তু নিজে কখন দুই ছত্র বাঙ্গালা লিখিযাছেন বলিযা বোধ হয না। বুদ্ধিমানেবা এইরূপই কবিযা থাকেন। পবেব সাহিত্যে যাহা জ্ঞাতব্য থাকে তাহা সংগ্রহ কবিবাব নিমিত্ত তাঁহাবা উহা অধ্যযন কবেন। পবেব সাহিত্যে সুলেখক হইবাব আকাঙ্ক্ষায প্রাণান্তকব চেষ্টা করা, তাঁহারা অতিশয বুদ্ধিহীনতাব কার্য্য মনে কবেন। কিন্তু আমবা বুদ্ধিমানেব অপেক্ষাও বুদ্ধিমান। আমবা ইংবাজেব ন্যায ইংবাজী লিখিবাব জন্য অথবা ইংরাজেব অপেক্ষাও ভাল ইংবাজী লেখক বলিযা প্রশংসিত হইবাব জন্য প্রাণপাত কবি, আর আমাদেব

মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করি ও মাতৃভাষায় দুই ছত্র লেখা ঘোর দুষ্কর্ম্ম মনে করি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পরের রচনা প্রণালীতে নৈপুণ্য লাভ করা বিশেষ গর্হিত কার্য্য নহে। জ্ঞান সংগ্রহার্থ পরের সাহিত্যের যে অনুশীলন করা যায়, তাহার ফল স্বরূপ পরের ভাষায় লিখিবার যতটুকু ক্ষমতা জন্মিয়া যায়, ততটুকু লাভ করা সম্বন্ধে কোন আপত্তি হইতে পারে না। যাঁহাদিগকে ইংরাজী সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাসাদির অধ্যাপকতা করিতে হইবে, ইংরাজী রচনা প্রণালীতে গাঢ় প্রবেশের জন্য প্রাণপণ করা, তাঁহাদের একান্ত কর্ত্তব্যও বটে। কিন্তু সাধারণতঃ একথা বলা যাইতে পারে যে, ইংরাজী সাহিত্যের প্রতি অতিরিক্ত পক্ষপাত ও অনুরাগ বশতঃ ইংরাজী রচনায় সিদ্ধ হইবার জন্য সদাই ব্যস্ত ও বিব্রত হইয়া থাকা, কোন বাঙ্গালীরই প্রশংসা বা গৌরবের কথা নহে। ইংরাজী সাহিত্যের প্রতি অযথা পক্ষপাতিত্ব পরিত্যক্ত হইলে, আমাদের মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ জন্মিবে এবং ইংরাজের ন্যায় বাঙ্গালা না লিখিয়া আমরা বাঙ্গালীর ন্যায় বাঙ্গালা লিখিবার উপযোগী হইব।

আরও একটী কথা আছে। ইংরাজী রচনায় সুনিপুণ এমন যে সকল বাঙ্গালী মহোদয়দিগের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা বাঙ্গালা লিখিতেন তাঁহারা বিলাতী বাঙ্গালাই লিখিতেন। তাঁহাদের বিলাতী বাঙ্গালা লিখিবার কথাও বটে। তাঁহারা যে কেবল ইংরাজী না লিখিয়া বাঙ্গালা লিখিতেন এবং আপনাদের ইংরাজীশিক্ষালব্ধ জ্ঞান স্বদেশীয়-দিগকে দিবার নিমিত্ত আগ্রহ সহকারেই উহা লিখিতেন, ইহা যথার্থই তাঁহাদিগের প্রশংসা ও গৌরবের কথা। কিন্তু এখন যাঁহারা বিলাতী বাঙ্গালা লেখেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই সেই মহাত্মা দিগের ন্যায় ইংরাজী বিদ্যাও নাই, ইংরাজী লিপিকুশলতাও নাই। পূর্ব্বের মহাত্মাগণ যে কারণে বিলাতী বাঙ্গালা লিখিতেন, ইঁহারা সে কারণে লেখেন না। তাঁহাদের অপেক্ষা ইহাঁদের চিত্তের দুর্ব্বলতা অনেক বেশী এবং স্বদেশবাসীর মঙ্গলসাধনেচ্ছা অনেক কম বলিয়া, ইহাঁরা বিলাতী বাঙ্গালা লেখেন। অনেকে তাঁহাদিগকে বেশী বিলাতী ভাবাপন্ন আর ইহাঁদিগকে বেশী দেশী ভাবাপন্ন বলিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত

কথা তাহা নহে। তুলনায় তাঁহারাই ছিলেন বেশী দেশী ভাবাপন্ন, ইহাঁরাই বেশী বিলাতী ভাবাপন্ন। তাঁহাদের সারবত্তা বেশী ছিল, ইঁহাদেব সারবত্তা কম হইযাছে। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ও প্রকৃতি দৃষ্টে আমাদিগকে এই ভযাবহ সিদ্ধান্ত করিতে হইযাছে। মনুষ্যত্ব ও মানসিক সাববত্তা বৃদ্ধি করা সহজ কাজ নয়। অটল প্রতিজ্ঞায, অসংখ্য উপাযে, অশেষ প্রযাসে উহা বৃদ্ধি কবিতে হয়। বিলাতী বাঙ্গালার পবিবর্ত্তে দেশীয বাঙ্গালা লিখিবার প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত করিতে পাবিলে, মনুষ্যত্ব ও মানসিক সাববত্তা বৃদ্ধি করিবার একটী উপায আমাদেব আযত্ত হইবে। আমাদের ভাষা বিশুদ্ধ করিব, প্রথমে এই অভিপ্রাযে উহাতে যে ইংবাজীর দাগ লাগিতেছে, তাহা মুছিতে আরম্ভ করিতে হইবে। মুছিতে মুছিতে কেবল যে আমাদের ভাষা পবিষ্কাব হইবে তাহা নহে, আমাদের মনও পরিষ্কার হইয়া উঠিবে, আমাদেব মতি গতি প্রবৃত্তিও দিন দিন মনুষ্যত্বলাভের অধিকতর অনুকূল হইয়া পড়িবে। মনের সংস্কারে মনুষ্যত্ব। ইংরাজী শিক্ষার ফলে অখাদ্য খাইবার যে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে, তাহা

পরিত্যাগ করা যেমন কর্ত্তব্য, এবং তাহার পরাজয়ে যেমন মনুষ্যত্ব লাভ হয, ইংরাজী শিক্ষার ফলে বিলাতী বাঙ্গালা লিখিবার যে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে, তাহা পরিত্যাগ করাও তেমনই কর্ত্তব্য এবং তাহার পরাজয়েও তেমনই মনুষ্যত্ব লাভ হয। বিলাতী বাঙ্গালার বিলোপ করিযা আমাদের মাতৃভাষার বিশুদ্ধি সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলে, আমাদের মাতৃভাষাও আমাদিগকে মানুষ করিযা দিবেন। বিলাতী বাঙ্গালাব বিলোপ কবাও বড় কঠিন নহে। কি প্রণালীতে উহাব বিলোপ করিতে পারা যায়, পূর্ব্বে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি।

কেহ কেহ বলেন যে বিলাতী বাঙ্গালা নিতান্ত নিন্দনীয় নহে। তাঁহাদের মতে, উহাব ব্যবহারে দরিদ্র বাঙ্গালা ভাষার শক্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয। কিন্তু যাঁহারা এই রূপ বাঙ্গালার ব্যবহার করেন, তাঁহারা আপন ভাষার শক্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে ব্যবহার করেন, এরূপ বোধ হয না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা অধিক ইংরাজী শিক্ষার ফল স্বরূপ, কেহ বা ইংরাজীর প্রতি অর্থাৎ পক্ষপাতিত্ব বশতঃ,

এই রূপ বাঙ্গালার ব্যবহার করেন। যাঁহারা পক্ষপাতিত্বে এই কাজ করেন, তাঁহারা যে অতি গর্হিতাচারী, ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। তাঁহাদের আচরণ, কাহারই অনুকরণীয় নহে। যাঁহারা শুদ্ধ ইংরাজী অনুশীলনের ফলে এইরূপ বাঙ্গালা ব্যবহার করিয়া ফেলেন, কিন্তু এরূপ বাঙ্গালা ভাল এমন কথা বলেন না, তাঁহারাও কাহারও অনুকরণীয় নহেন। যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, ইংরাজী শিক্ষিতদিগের রচিত বাঙ্গালা সাহিত্য পাঠ করিয়া তাঁহাদের যত উপকৃত হইবার কথা, যাঁহারা ইংরাজী জানেন তাঁহাদের তত উপকার হইতে পারে না। কারণ সে সাহিত্যে যাহা থাকে, ইংরাজী শিক্ষিতেরা তাহার অধিকাংশ ইংরাজীতেই পাইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, তাঁহারা বিলাতী বাঙ্গালা বুঝিতে পারেন না। সুতরাং বিলাতী বাঙ্গালার ব্যবহারে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের শক্তি ও সমৃদ্ধির হ্রাস না হইয়া বৃদ্ধি হয়, বোধ হয় ইহার অপেক্ষা ভ্রান্ত সংস্কার আর হইতে পারে না। আর যে প্রকার বাঙ্গালায় আমাদের সাহিত্যে সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা সংঘটিত করিতেছে, তাহাতে বাঙ্গালা

ভাষা ও সাহিত্যের শক্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইবে, বোধ হয় ইহার অপেক্ষা বিচিত্র কথাও আর হইতে পারে না। যদি কাঁহারও এরূপ ধারণা হইয়া থাকে যে, বিলাতী বাঙ্গালার ব্যবহার করিয়া বাঙ্গালা ভাষার শক্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে তাঁহাকে এই কথা বলিব যে, বাঙ্গালা ভাষার শক্তিসমৃদ্ধি বাড়াইবার জন্য বিদেশীয় ভাষার সাহায্য লইবার অগ্রে, বাঙ্গালা ভাষার সাহায্য লওযাই বাঙ্গালীর উপযুক্ত কাজ। বিলাতী বাঙ্গালায় যে সকল উদাহরণ দিযাছি তন্মধ্যে এমন একটীও নাই যাহার অর্থ দেশী বাঙ্গালায প্রকাশ করিতে পারা যায় না। দেশী ধবণে অর্থ প্রকাশ করিতে পারা সম্ভব হইলে, বিলাতী ধরণে অর্থ প্রকাশ করা কোন বাঙ্গালীরই কর্ত্তব্য নহে। বাঙ্গালা ভাষার মধ্যেই যে শক্তি নিহিত আছে, অক্বাবণে বিলাতী বাঙ্গালা লিখিলে তাহার বিকাশের ব্যাঘাত হইয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যেব শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইবে এবং বাঙ্গালী লেখকের আত্মমর্য্যাদাবোধ ও স্বদেশপ্রিয়তার পরিবর্ত্তে অতি হেয ও আত্মশক্তি বিকাশের বিষম প্রতিকূল পরানুকরণপ্রিয়তাই প্রকাশ পাইবে।

পণ্ডিত শ্রেণীর অনেক লোকে এখনও বাঙ্গালা লিখিতেছেন। তাঁহারা যে বাঙ্গালা লেখেন তাহাও বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য বলিয়া গণ্য। তাঁহাদের বাঙ্গালা লেখা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের যে কয়টি লক্ষণের আলোচনা করিলাম, তাঁহাদের লেখায় তন্মধ্যে দুইটী একবারেই দৃষ্ট হয় না। তাঁহারা গ্রাম্যতাদির প্রয়োগ করেন না, তাঁহারা বিলাতী বাঙ্গালাও লেখেন না। তৃতীয় লক্ষণ প্রাদেশিকতাও তাঁহাদের লেখায় অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। এই কয়টী লক্ষণ সম্বন্ধে তাঁহাদের রচিত সাহিত্যাংশ যথার্থই অতি বিশুদ্ধ, জাতীয় ভাবাপন্ন ও আদর্শ-বৎ। কিন্তু তাঁহাদের লেখায় একটী গুরুতর দোষ আছে। বৃহৎ বৃহৎ অথবা অতি অপ্রচলিত অথবা উভয়বিধ সংস্কৃত শব্দের বহুল ব্যবহারের জন্য তাঁহাদের লিখিত বাঙ্গালা শুধু যে সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের দুর্বোধ হয় তাহা নহে, অনেক বিদ্বানের নিকটেও দুরূহ হইয়া থাকে। এরূপ লেখা অতি অল্প লোকেরই আয়ত্ত হইতে পারে। এরূপ লেখাদ্বারা লোক সাধারণকে শিক্ষিত করিতে

পারা বড় কঠিন। সুতরাং এরূপ লেখা প্রকৃত সাহিত্য বলিযা গণ্য হইবাব যোগ্য নহে। বিলাতী বাঙ্গালাব ন্যায় এরূপ লেখাও সাম্প্রদাযিক লেখা। তবে পরানুকরণপ্রিযতায এ লেখাব উৎপত্তি নহে বলিযা, বিলাতী বাঙ্গালা যেমন দূষণীয এবং বাঙ্গালী ও বাঙ্গালা সাহিত্যেব অনিষ্টকর, ইহা তেমন নহে। বড়ই দুঃখের বিষয, পণ্ডিত শ্রেণীর লোক ও লেখকেরা এই রূপ লেখার বিষম পক্ষপাতী। এক ব্যক্তি ছোট ছোট বালকদেব উপযোগী সহজ ও সবল ভাষায একখানি পাঠ্য পুস্তক প্রণযন করিযা, কলিকাতার একটী প্রধান বিদ্যালযে উহা প্রবর্ত্তিত কবাইবাব প্রযাসী হইযাছিলেন। কিন্তু বিদ্যালযের পণ্ডিত মহাশযেবা পুস্তকখানি প্রবর্ত্তিত না কবিতে পাবিবাব এই হেতু নির্দ্দেশ কবিযা ছিলেন যে, উহাব ভাষা এত সহজ ও সবল যে উহা পাঠ করিযা বালকদিগেব শব্দ শিক্ষা একেবাবেই হইবেনা, এমন কি, উহা আযত্ত কবিবাব জন্য তাহাদিগকে কখন অভিধান খুলিতে হইবে না। এই শ্রেণীর লেখকেবা অতিশয শাব্দিকতাপ্রিয। বোধ হয় তাঁহাদের এইরূপ সংস্কার

যে, শাব্দিকতাতেই সাহিত্যের সৌন্দর্য্য ও উৎকর্ষ। সন্ধি সমাসাদির সাহায্যে তাঁহারা অসুচ্চার্য্য ও অপরিমিত দৈর্ঘ্যসম্পন্ন শব্দ বচনা করিযা, তদ্দ্বারা তাঁহাদের গ্রন্থাদি লোকসাধারণের সম্পূর্ণ অনুপযোগী ও অপাঠ্য করিযা ফেলেন। তাঁহাবা যে শ্রেণীস্থ সে শ্রেণীর লোকেব চিরন্তন সংস্কার এই যে, অধ্যযন কার্য্য লোক সাধারণেব নহে, শ্রেণী বিশেষেব। যাঁহাদেক এই রূপ সংস্কাব, গ্রন্থাদি লিখিবাব সময লোক সাধারণের উপযোগী করিযা লিখিবার আবশ্যকতাব কথা তাঁহাদেব মনে উদিত না হওযাই সম্ভব। বহুকালের সংস্কাব শীঘ্র ও সহজে পবিত্যাগ করা যায না। তাঁহাদেব বিশেষ দোষ নাই। কিন্তু অধ্যয়ন বা বিদ্যাশিক্ষা এখন পূর্ব্বেব ন্যায শ্রেণী বিশেষেব মধ্যে আবদ্ধ না থাকিযা, সকল শ্রেণীব মধ্যেই চলিতেছে, ইহা তাঁহাবা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। সুতরাং লোক সাধারণের হিতাহিতেব প্রতি দৃষ্টি বাখিযা গ্রন্থাদি লেখা আবশ্যক হইযাছে, ইহা তাঁহাদেরও বিবেচনা করা উচিত। বড় আহ্লাদের বিষয, তাঁহারা ইহা বুঝিতেছেন এবং ক্রমে আরও বুঝিবেন। প্রথমেই বলিয়াছি, তাঁহারা অনেক স্থলে নব্যদিগের

সহিত মিত্রতা করিযা নব্যদিগের কোন কোন বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ করা শ্রেয জ্ঞান করিতেছেন। ভাবনা পণ্ডিতেতর শ্রেণীব লেখক দিগের সম্বন্ধে। তাঁহাবা পণ্ডিত শ্রেণীর লেখক দিগের ন্যায কোন পুরাতন বদ্ধমূল সংস্কাবে আবদ্ধ নহেন। অথচ তাঁহাবাই সাহিত্যে নূতন নূতন সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদাযিকতাব সৃষ্টি করিতেছেন এবং লোক সাধাবণের হিতাহিতের প্রতি ও বাঙ্গালা সাহিত্যেব মর্য্যাদাব প্রতি অধিকতব অমনোযোগী হইতেছেন। পণ্ডিতশ্রেণীব লেখকদিগের বচনায স্বেচ্ছাচারিতার লেশ মাত্র নাই, তাঁহাদেব রচনা স্বেচ্ছাচাবিতা দোষে অতিশয দুষ্ট। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ স্থাপিত হওযায, তাঁহাদেব সম্বন্ধে আমার মনে কিঞ্চিৎ আশাব সঞ্চাব হইয়াছে। পরিষৎ স্থাপন পক্ষে পণ্ডিত শ্রেণীব লেখকদিগেব অপেক্ষা তাঁহাদেরই আযাস ও আগ্রহ অধিক। অতএব আশা হয যে, যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সাধনার্থ পরিষৎ স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের যদি এরূপ প্রতীতি হয় যে, বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের যে প্রকার সংস্কার ও

উন্নতির আবশ্যকতার কথা এই প্রবন্ধে কহিলাম. তাহা বাঞ্ছনীয়, তাহা হইলে তাঁহারা উহার সম্পাদনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পরিষদের সার্থকতা সাধন করিবেন।